## প্রস্তাবনা

> 'It was the best of times, it was the worst of times, it was the age of wisdom, it was the age of foolishness, it was the epoch of believe, it was the epoch of incredulity, it was the season of light, it was the season of Darkness, it was the spring of hope, it was the winter of despair, we had everything before us, we had nothing before us, we are all going direct to Heaven, we are all going direct the other way...' ---A Tale of Two Cities / Charles Dickens

উপরোক্ত এই প্রগাঢ় উপলব্ধির নির্যাস রচিত হয়েছিল বিখ্যাত ইংরেজ ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সের (১৮১২-১৮৭০ খ্রিস্টাব্দ) কলমে। কালজয়ী সেই সৃষ্টির নাম 'A Tale of Two Cities' (১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দ)। কিন্তু জীবন-মন্থনের ফলে জাত উপলব্ধিকে তো কেবল বিশেষ দেশ-কালের সীমায় বেঁধে রাখা যায় না। তাই আশ্চর্য সমাপতনে বাঙালি জীবনে উনিশ শতকের অভিঘাত বোঝাতে অমোঘ হয়ে ওঠে এই অক্ষরমালা। ভালো-মন্দে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বে, আলো-আঁধারে, আশা-নিরাশায়, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে উনিশ শতক বাঙালির জীবন-ইতিহাসে এক মাহেন্দ্রক্ষণ। অতীতের চিরন্তন ঐতিহ্য আর নব্য আধুনিকতার দ্বন্দ্বে এই পর্বের সমাজ বিপুল আন্দোলিত। এই বিশেষ কালপর্বেই নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে দ্বিধাজড়িত পদক্ষেপে বাঙালির সমাজ এবং জীবন নতুন পথের অন্বেষণ করেছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দুই ভিন্নধর্মী, ভিন্ন-মাত্রিক আদর্শ প্রাথমিক সংঘাতের সমুদ্র মন্থন করে শেষপর্যন্ত খুঁজে পেয়েছে সমন্বয়ের অমৃতফল। উভয়ের মিলনেই জন্ম নিয়েছে বহু-কাঙ্ক্ষিত নবজাগরণের স্বপ্নের ভ্রূণ। বিচার করে দেখলে বাঙালির সবচেয়ে টানাপোড়েন আর স্ববিরোধের যুগ এই উনিশ শতক। এই বহুমাত্রিক যুগ সম্পর্কে মননশীল মানুষের আগ্রহ অনেককালের। কাজেই নানা রূপে, নানা আঙ্গিকে উনিশ শতক চর্চা অব্যাহত থেকেছে বরাবর। যে যুগ বিভিন্ন দিক থেকে, বিভিন্ন অভিমুখ থেকে বহু আলোচিত, সেই যুগের সাহিত্য, সংস্কৃতি, সমাজ সমস্তই যেখানে বিদ্যোৎসাহীদের দ্বারা বিশ্লেষিত, সেখানে নতুন কথা বলার স্পর্ধা অবশ্যই কঠিন কাজ। তবু, ঘটনা এটাই যে, আমার মত অর্বাচীনের আগ্রহের কেন্দ্রেও উজ্জ্বল ভাবে বিরাজ করছে উনিশ শতক। শুধু এই ভরসায় যে, কালান্তরে গবেষকের ভূমিকা আবিষ্কারকের। যে কোনও যুগের ওপর দিয়ে কালের একটা দীর্ঘ স্রোত বয়ে না যাওয়া অবধি তাকে যথার্থ বিশ্লেষণ করার মতো প্রজ্ঞা অর্জন সম্ভব নয়। সময়ের উত্তাপ শীতল

হয়ে এলে নিরপেক্ষ দূরত্ব থেকে একটি বিশেষ কালকে ফিরে দেখলে চোখে পড়ে সে নিজের জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে রেখে গেছে নানাবিধ সূত্র। আগামীর চোখে ধরা পড়ে তার ভিন্ন মাত্রা। আমার গবেষণার ক্ষেত্রে স্থান, কাল এবং বিষয় এই তিন সূত্রই আমার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই গবেষণার স্থান নগর কলকাতা, কাল উনিশ শতক এবং বিষয় সেই সময়-পর্বের শিষ্ট নাগরিক সাহিত্য বনাম অপর সাহিত্যের দ্বান্দ্বিকতা। নানা তথ্য এবং সত্যের সমাবেশে উনিশ শতকের কলকাতার শিষ্ট নাগরিক সাহিত্য ও অপর সাহিত্যের দ্বান্দ্বিকতার রূপরেখা তুলে ধরাই আমার উদ্দেশ্য।

এক্ষেত্রে শিষ্ট নাগরিক বা মান্য সাহিত্য এবং অপর বা অ-নাগরিক সাহিত্য বলতে কী বোঝাচ্ছে সে সম্পর্কে একটি ধারণা দেওয়া প্রয়োজন। শিষ্ট নাগরিক বা মান্য সাহিত্য বলতে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে উনিশ শতকের মূলধারার সাহিত্যকে, যা প্রধানত নবজাগরণের পটভূমিতে, যুগের দাবিতে, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতির স্পর্শ লাভের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছিল। বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডে পরিণত হবার পর পাশ্চাত্য প্রভুশক্তির অঙ্গুলিহেলনে প্রশাসনিক কাঠামো পরিবর্তিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যের ধারাপথেও একটা পরিবর্তনের জোয়ার এসেছিল। বদলে যাওয়া যুগ, জীবন এবং রুচির তাগিদে এতকালের প্রচলিত সাহিত্যধারায় প্রবাহিত হয়েছিল নতুন স্রোত। নব্য শিক্ষার জলবায়ুতে পুষ্ট হয়ে জন্মলাভ করেছিল নতুন দিনের নতুন সাহিত্যের অঙ্কুর, যা মূলত পাশ্চাত্য প্রভাবজাত। পাশ্চাত্য সাহিত্যের নানা রূপভেদ বাংলা সাহিত্যের সামনে নতুন পথের দিশা খুলে দিয়েছিল। সাহিত্যের বিচারেও তা স্বাভাবিকভাবেই স্বতন্ত্র মূল্যবোধের জন্ম দিয়েছিল। তখন থেকেই ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত তথাকথিত ভদ্র শ্রেণির মধ্যে এই জাতীয় সাহিত্যের চর্চা শুরু হয়েছিল। তাদের দ্বারাই সৃষ্ট এবং আস্বাদিত হতে শুরু করেছিল সাহিত্যের এই নানাবিধ শাখার নতুন সামগ্রী। এই ধারা আলোকপ্রাপ্ত শিক্ষিত শিষ্ট সম্প্রদায়ের মনন-চর্চার ফসল বললে অত্যুক্তি হয় না।

কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা অবশ্যই মনে রাখা প্রয়োজন, তা হল এই নব্য সাহিত্যের পোষকতা করতে গিয়ে অনেকক্ষেত্রেই ব্রাত্য করে দেওয়া হয়েছিল আমাদের অতীতের সাহিত্যের মূলধারাকেও। উনিশের মূলধারার সাহিত্য যেমন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য প্রভুর প্রভাব এবং প্রসাদ-পুষ্ট, ঠিক তেমনি তার আগেও শাসকের অনুগ্রহ-পুষ্ট সাহিত্যের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু তার সঙ্গে উনিশের নব্য শিষ্ট সাহিত্যের ফারাকও অনেক। অতীতের মান্য সাহিত্যও শেষ পর্যন্ত তার গৌরব আর মর্যাদা বজায় রাখতে পারেনি। অর্থাৎ অতীতে যা ছিল তথাকথিত রাজপুরুষ, অভিজাত বা বিদগ্ধ মানুষের আস্বাদনের বস্তু, তাও নব্য শিক্ষিতের নাগরিক রুচির কাছে অবহেলিত এবং অভিযুক্ত হয়েছিল নানা কারণে। সুতরাং শিষ্ট সাহিত্য এদিক থেকে একেবারেই একটি পারিভাষিক রাজনৈতিক

সংজ্ঞা, যা শাসকের রুচির সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজেকে নির্মাণ করে নেয়, নিজেকে পরিমার্জিত এবং পরিশীলিত করে যুগের প্রতিনিধি স্থানীয় হয়ে ওঠে।

ঠিক এর বিপরীতে অপর সাহিত্য বলতে বোঝাতে চাওয়া হয়েছে দীর্ঘকাল ধরে এদেশের জনমানসের জীবন চর্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত আমাদের দেশজ সাহিত্য-ধারাকে, যা উনিশ শতকের নবজাগৃতির ছোঁয়ায় ঋদ্ধ মুষ্টিমেয় মানুষের জ্ঞানচর্চার সীমানা ছাড়িয়ে বিস্তৃত ছিল আপামর জনসাধারণের অঙ্গনে। এই সাহিত্য ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠের, এই সাহিত্য ছিল জনপ্রিয়। তবে বৃহত্তর এই জনসমাজের রুচি আর চাহিদা অনুযায়ী গড়ে ওঠা এই সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারাটি কিন্তু বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির মূলধারার চর্চায় সেভাবে স্থান পায়নি। এদেশের জনসাধারণের জীবনচর্যার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকার পরেও তার সেভাবে সংরক্ষণ হয়নি। পাশ্চাত্যের মডেল নির্ভর মূলধারার সাহিত্য-সংস্কৃতিকে সৃজন করে তোলার প্রক্রিয়ায় এতকালের জীবন-ঘনিষ্ঠ সাহিত্য-সংস্কৃতিকে দূরে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। নতুন চেতনার সন্ধান করতে গিয়ে ক্রমশ এত বেশি পরনির্ভরশীলতা গ্রাস করেছে যে যুগ পরম্পরায় বাহিত দেশজ সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে উপেক্ষা করতে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ হয়নি। বরং সচেতন উন্নাসিকতায় বেড়েছে ব্যবধান।

এর মধ্যে একটা সচেতন সাংস্কৃতিক রাজনীতির অঙ্ক দেখতে পাওয়া যায়। এ এক চিরায়ত সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের খেলা, যা এক নতুন মোড়ক নিয়ে আবির্ভূত হয়েছে উনিশ শতকের বুকে। প্রভু-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্বকে মাথা নত করে মেনে নেবার অনিবার্য নেশায় একটু একটু করে হারাতে শুরু করেছে এতকালের প্রচলিত দেশজ সাহিত্য-সংস্কৃতির গভীর ভূমি। আলগা হয়ে গেছে তার শিকড়ের টান। তার স্থান হয়েছে নগরের উপান্তে, এমনকি জীবনেরও উপান্তে। সে হয়ে পড়েছে অজ্ঞাতকুলশীল, উপেক্ষিত এবং অনাদৃত। ফলে উনিশ শতকের সাহিত্য-সংস্কৃতির ধারাপথে একটা স্পষ্ট বিভাজন-রেখার অস্তিত্ব অনুভূত হয়। ভেদ-রেখার একদিকে পরিশীলিত শিষ্ট নাগরিক সাহিত্য, অন্যদিকে অপর সাহিত্য।

উনিশ শতকের 'অপর'-এর প্রসঙ্গে অনুশীলনের ক্ষেত্রে বটতলা বিষয়ে আলোকপাত করেছিলেন শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত সুকুমার সেন, বিনয় ঘোষ তাতে সংযোজন করেছিলেন নতুন মাত্রা। তারপর এই সময়পর্বের 'অপর'এর অশ্রুত কণ্ঠস্বর নিয়ে দীর্ঘদিন চর্চা করেছেন সুমন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, অদ্রীশ বিশ্বাস প্রমুখ গবেষকেরা। এঁদের কাছে ঋণ স্বীকার করেও আমার এই অভিসন্দর্ভ খুঁজে নিয়েছে উনিশ শতকের কলকাতার বুকে ঘনিয়ে ওঠা দুই ধারার সাহিত্য-সংস্কৃতির মহারণের ভিন্ন মাত্রা। আমার গবেষণায় এই দুই ধারার দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের সমীকরণ রচনা-পর্বে বিষয়কে উপস্থাপনের সুবিধার্থে সমগ্র আলোচনাটিকে ছয়টি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করেছি এবং প্রয়োজনমত

অধ্যায়গুলিকে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিভাজিত করেছি। বিভিন্ন অধ্যায়ে পর্যায়ক্রমে দেখাতে চেয়েছি উনিশ শতকের নগর কলকাতার আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কেমনভাবে নব্য শিক্ষার মানদণ্ডে নতুন 'ভদ্রলোকের' সংজ্ঞা নির্মিত হচ্ছে, আর তাদের সাপেক্ষে নির্ধারিত হচ্ছে তথাকথিত 'অপর' এর অবস্থান। এই সময়-পর্বেই বাঙালি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণির আবির্ভাব হয়। যদি ভদ্রলোকের ইতিহাস খুঁজি তাহলে দেখতে পাব অতি প্রাচীনকাল থেকেই সমাজে এই শ্রেণির অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু সেই ভদ্রলোক ছিল জাতি বা বর্ণগতভাবে স্বতন্ত্র এক শ্রেণি। এদিকে উনিশ শতকে এসে পাশ্চাত্য প্রভুশক্তির অঙ্গুলিহেলনে নতুন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিতে ভদ্রলোকের ধারণাটি বিবর্তিত হতে লাগল। বাঙালি ভদ্রলোক বলতে উনিশ শতকের শিক্ষিত আলোকপ্রাপ্ত প্রভাব আর প্রতাপশালী নাগরিকদের বোঝানো হতে লাগল। আর উনিশের নবজাগৃতির বাইরে থেকে যাওয়া আপামর জনতা হয়ে উঠল অপর। তারপরে আলোচনা করেছি মান্য তথা নাগরিক সাহিত্য-সংস্কৃতির উদ্ভব-বিকাশ-বিবর্তনের প্রসঙ্গে। তারপরের অধ্যায়ে অপর সাহিত্যের পরম্পরা সন্ধান করতে চেয়েছি এবং কৌশলে কেমনভাবে কোনও বিষয়কে 'অপর'এ পর্যবসিত করা হয় সে সম্পর্কে আলোকপাত করেছি। আসলে সামাজিক দিক থেকে যারা মান্য বা শিষ্ট নাগরিক শিক্ষা-সভ্যতা-সংস্কৃতির বৃত্তের বাইরে অবস্থান করছে, তাদের সৃষ্টিও কোথাও গিয়ে হয়ে উঠেছে অপর। তারা পাশ্চাত্য শিক্ষা-সভ্যতার আলোকিত জগতের বাইরের মানুষ, তারা কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী, তারা সংখ্যার দিক থেকে যাই হোক না কেন, গুরুত্বের দিক থেকে খাটো। সুতরাং তাদের দ্বারা সৃষ্ট বা আস্বাদিত সাহিত্য অপর, তাদের সংস্কৃতিও তাই। তারপরের অধ্যায়ে আমি মান্য তথা শিষ্ট নাগরিক সাহিত্যের সঙ্গে অপর তথা অনাগরিক সাহিত্যের এবং সংস্কৃতির সংঘাতটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। আমি উভয় সাহিত্যে ব্যক্ত ভাষা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অভিব্যক্তি, নান্দনিকতা, নাগরিকতা, জীবনদর্শন, ঐতিহাসিক চেতনা, নর-নারী সম্পর্ক, শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রসঙ্গ ইত্যাদি নানা দিক থেকে উভয় সাহিত্যের তুল্যমূল্য বিচার করার চেষ্টা করেছি। সেখানে দেখা গেছে এরা কেউই কাউকে সহজে জমি ছেড়ে দেয়নি। মান্য এবং অপর দুই ধারার সাহিত্যেই পারস্পরিক দ্বন্দ্বের ছায়া মিলেছে। মান্য বা শিষ্ট সাহিত্যে যেমন ভাবে অপর সাহিত্যকে অবজ্ঞা, উপেক্ষা করা হয়েছে, তার প্রতি অবহেলা দেখানো হয়েছে, তাকে নির্মমভাবে আক্রমণ করা হয়েছে, তেমনভাবেই অপর সাহিত্যও হয়ে উঠেছে মূলধারার সাহিত্যের এবং তার ধারক-বাহকদের কঠোর সমালোচক। তারপরের অধ্যায়ে দেখিয়েছি এই দ্বান্দ্বিকতার ফলাফল। সেখানে পরিণামে সংখ্যাগরিষ্ঠের জিত হয়নি। জিত হয়েছে ক্ষমতার। এটা জ্ঞান ও ক্ষমতার প্রকৃত দৃষ্টান্ত। এটাকে মিশেল ফুকোর সেই 'পাওয়ার নলেজ' এর সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। আসলে পাওয়ার নলেজ বা জ্ঞান-ক্ষমতা এমনভাবে কাজ

করে যে তার অননুমোদিত সবকিছু আস্তে আস্তে মাইনর নলেজে পর্যবসিত হয়। এভাবেই নির্মিত হয়ে ওঠে একটা মূলধারা বা মেইন স্ট্রিম, আর বাকি সবকিছু হয়ে ওঠে অপর বা প্রান্তিক। এখানেও তেমনটা ঘটেছে। আর এই সবের মূলে রয়ে গেছে আধিপত্য আর আনুগত্যের চিরন্তন সমীকরণ।

চিরকালই উচ্চবর্গ এবং ক্ষমতাবান নিজেদের পছন্দকে প্রাধান্য দিয়ে মহিমান্বিত করে অপছন্দকে ব্রাত্য করে দিতে চায়। ছলনার রাজনীতিতে বড় বেশি পাকাপোক্ত বলেই বোধহয় তাদের নির্মিত অথবা অনুমোদিত সবকিছুই সমস্ত আলো শুষে নেয়, বাকি সবটুকু থেকে যায় অন্ধকারে। এ এক আশ্চর্য সাংস্কৃতিক রাজনীতি, যার ফলে কৌশলে ভুলিয়ে দিতে চাওয়া হয় শিকড়ের টান। এখানেও এই রাজনীতির চোরাস্রোতের আবর্তেই আমাদের নিজস্ব সাহিত্যধারা 'অপর' নামে অভিহিত হয়ে নিন্দিত আর নির্যাতিত হয়েছে আমাদেরই হাতে। অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ক্রমশ পিছিয়ে পড়েছে। আমরাই তাকে হারিয়ে যেতে দিয়েছি।

আমার এই তুলনামূলক নিরীক্ষা গতে বাঁধা উনিশ শতক চর্চার বাইরে এক অন্যতর সন্ধান, নানা রঙের হারিয়ে যাওয়া দিনগুলিকে খুঁজে ফেরার ক্ষুদ্র প্রয়াস। চেতনার মন্বন্তরের বিপরীতে শিকড়ের সন্ধান। যতটা পারা যায় অস্তিত্বের ভিতরের দিকে তাকানো। তবে শুধু অতীতের সত্তার নির্যাস সংগ্রহে তা থেমে থাকেনি, বরং তারই ফাঁকে ফাঁকে চিনে নিয়েছে আধিপত্যের, দখলদারির, আগ্রাসনের বিভিন্ন চেহারা। এই সন্ধানের মধ্যে অনেকেই খুঁজে পেতে পারেন সমাজতত্ত্বের নানা অভিমুখ। ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় একালের বিদ্যাচর্চার প্রতিটি মহলই পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। দর্শন, ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ও সাহিত্যের মধ্যে সূক্ষ্মভাবে পারস্পরিক সংযোগসূত্র বিদ্যমান। কাজেই বিদ্যাচর্চার একটি শাখাকে উপযুক্তভাবে ব্যাখ্যায় বিদ্যাচর্চার আরেকটি বিশেষ শাখার দ্বারস্থ হওয়া আবশ্যক। বিশেষত আজকের পৃথিবীতে সাহিত্য ক্ষেত্র-বিশেষে সমাজবিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে পরিগণিত হওয়া উচিত। সাহিত্য যে সময় এবং সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে, তাকে উপযুক্তভাবে বুঝে নিতে চাইলে এই আন্তঃসম্পর্ককে স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন। সে সময় এসে গেছে।

ক্ষমতার রাজনীতি বার বার নানা ছদ্মবেশে ফিরে আসে। আজও সে বিরাজ করছে বিভিন্ন রূপে। তাই আজকের পৃথিবীব্যাপী সাংস্কৃতিক আধিপত্যবাদের আগ্রাসনের সামনে দাঁড়িয়েও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে নবজাগৃতির আলোকিত প্রহরে ঘটা সেই দ্বৈরথের সূত্র-সন্ধান। এই কাজে অগ্রপথিকদের রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে গ্রহণ করেছি নানা প্রয়োজনীয় তথ্য। সূত্র নির্দেশিকায় যথাসাধ্য ঋণস্বীকারও করেছি। এই অন্বেষণে আমাকে সর্বতোভাবে সহায়তা করেছেন আমার গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক অধ্যাপক ড.

সন্দীপকুমার মণ্ডল। তাঁর কাছে অজস্র প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হয়েছি বার বার। তিনি সর্বদাই আমাকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে আলোচনায় ভাবনার পরিসর বেড়েছে, নতুন চিন্তার খোরাক পেয়েছি, ঋদ্ধ হয়েছি। তাছাড়া প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রাবস্থায় বাংলা বিভাগে যে সমস্ত গুণীজনের সান্নিধ্য লাভ করেছিলাম, যাঁদের হাত ধরে আমার সামনে খুলে গিয়েছিল এক নতুন পৃথিবীর দরজা, সেই অধ্যাপকদের উৎসাহ আর প্রশ্রয় আমাকে নিরন্তর সাহস যুগিয়েছে। বাবা-মা মনের মাটিতে বুনে দিয়েছিলেন আত্মপ্রত্যয়ের বীজ, যা অন্ধকার সময়েও আলোকবর্তিকার কাজ করেছে। নানা বাধা আর না-পারার অক্ষমতাকে কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা যুগিয়েছে। পরিবার দিয়েছে শক্তি, বন্ধুরা দিয়েছে আন্তরিক শুভেচ্ছা। জাগতিক বন্ধন অতিক্রম করে আলোকবর্ষ দূরত্বে চলে যাওয়া বাবা, আমার সমস্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাজের প্রেরণা-দাত্রী মা, আমার প্রণম্য অধ্যাপকবৃন্দ, আমার একান্নবর্তী পরিবার এবং বন্ধুদের কাছে তাই রয়ে গেল অপরিশোধ্য ঋণ। এই কাজের প্রয়োজনে বইপত্র সন্ধান করতে গিয়ে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বিভাগীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, উত্তরপাড়া জয়কৃষ্ণ সাধারণ গ্রন্থাগার, উত্তরপাড়া সারস্বত সম্মিলন গ্রন্থাগার, West Bengal Public Library Network থেকে অকৃপণ সহায়তা লাভ করেছি। সকলের কাছেই আমি কৃতজ্ঞ। এই গবেষণার ক্ষেত্রে তুলনামূলক আলোচনার মধ্যে দিয়ে ব্যাখ্যা করা হয়েছে শিষ্ট নাগরিক এবং অপর সাহিত্যের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের রূপরেখাটিকে। আর যেহেতু বিষয়টি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিদ্যাচর্চার অন্যান্য ক্ষেত্রের কিছু সূত্র প্রাসঙ্গিকভাবে এসেছে, ফলে এটি অন্তর্বিদ্যামূলক (Interdisciplinary) গবেষণা পদ্ধতির পথ নিয়েছে। এই গবেষণাপত্র রচনার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির বাংলা বানানবিধি অনুসৃত হয়েছে।

শেষে এটুকুই বলার যে, আসলে ঔপনিবেশিক প্রভুশক্তির পরানো মায়াকাজল মুছে ফেলে বেরিয়ে পড়তে পারলে, বন্ধক রাখা মগজকে ছাড়িয়ে নিয়ে মুক্ত মনে চারপাশে তাকাতে পারলে একটা উথাল-পাথাল, সজীব দেশের সন্ধান মেলে। তার আড়ম্বরহীন মৃত্তিকা-লগ্ন জীবন-গাঙে ডুবে যায় চাকচিক্যময় প্রভুত্ব-বাদী মায়া-বিশ্বের অস্তিত্ব। সেই বৃহৎ বিশ্ব শিকড়-সন্ধানী অনুসন্ধিৎসুকে গুপ্তধনের সঙ্কেত বলে দেয়। তার পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হলে লিখে ফেলা যায় একটি হারানো সময়কে অন্বেষণের কথকতা। সকলের কাছে সমস্ত ঋণ স্বীকার করেও সেই হারানো সময়ের স্পন্দনকে নিজের মত করে ছুঁয়ে দেখাই এখানে আমার একমাত্র লক্ষ্য।